চিরায়ত বই

২১

জননী

জননী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জননী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩২৫ টাকা

Janani a novel by Manik Bandyopadhyay Published by Kobi Prokashani
85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: September 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 325 Taka RS: 325 US$ 15
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96928-3-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

“বাংলার জননী– জীবনের অপূর্ব মৌলিক কাহিনী। সকল জন্মভূমি মৃত্তিকা, সকল জননী মানবী। মাটির মানুষের কাছে তাই জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়, জননী বড় দেবীর চেয়ে! শ্যামাকে মানিকবাবু দেবী করেন নাই, জননী করিয়াছেন।”

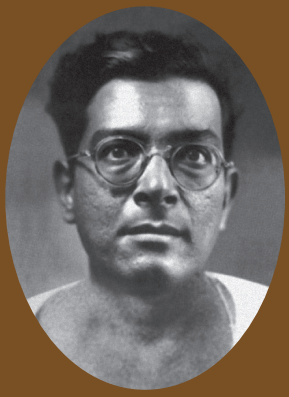

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে বিহারের সাঁওতাল পরগনা, বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরের বর্তমান লৌহজংয়ে। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। তার প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্যজগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে।

জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশ ছোটগল্প। তাঁর রচিত *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *পদ্মানদীর মাঝি* ইত্যাদি উপন্যাস ও *অতসীমামী*, *প্রাগৈতিহাসিক*, *ছোটবকুলপুরের যাত্রী* ইত্যাদি গল্পসংকলন বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজি ছাড়াও তাঁর রচনাসমূহ বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

দাম্পত্যসঙ্গী : কমলা দেবী। মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে।

১

সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুর্বরা থাকিয়া সন্তান লাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। ব্যর্থ আশাকে মানুষ আর কতকাল পোষণ করিতে পারে। সাত বছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাত্বের প্রমাণেরই শামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়। তারপর তার আর ভাইবোন হইলে সে বড় কলঙ্কের কথা হইত। শ্যামার যেন তাহা খেয়াল থাকে না। সে যেন ভুলিয়া যায় যে, তার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সাতভাই চম্পার একবোন পারুলই হয়তো সে হইত, বোনও যে তাহার দু-পাঁচটি থাকিত না, তাই বা কে বলিতে পারে? তবু, একটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষি ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে নিজে যখন এখন এক মার এক মেয়ে, দুটি একটির বেশি ছেলেমেয়ে তারও হইবে না।—বড়জোর তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে, এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মতো মা না হওয়ার জন্য এবং দৈব উপায়ে মা হইবার চেষ্টা করার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তার যখন প্রায় হিষ্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনাভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনোদিনই প্রায় থাকিত না, থাকিবার কেহ ছিল না—আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, তার ভয় হইল হঠাৎ বুঝি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে ক্রমান্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল একমাসে। কড়া শীতের সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সে জন্ম লইল শরৎকালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।

শ্যামার বধূজীবনের সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষ হইবার আগে ওসব যে তাহার খুব বেশি পরিমাণে ছিল তা বলা যায় না। জীবনে শ্যামার যদি কোনোদিন কোনো অসাধারণত্ব থাকিয়া থাকে, সে তাহার আত্মীয়স্বজনের একান্ত অভাব। জন্মের পর জগতে শ্যামার আপনার বলিতে ছিল মা আর এক মামা। এগারো বছর বয়সে সে মাকে হারায়। মামাকে হারায় বিবাহের এক বছরের মধ্যে। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাধিকারীবিহীন এই মামাটির কিছু সম্পত্তি না থাকিলে শীতল শ্যামাকে বিবাহ করিত কি না সন্দেহ।

মৃত্যুর মধ্যে মামাকে হারাইলে সম্পত্তি শ্যামা পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্যামার বিবাহের পর একা থাকিতে থাকিতে মামার মাথার কী যে গোলমাল হইয়া গেল, নিজের যা-কিছু ছিল চুপিচুপি জলের দামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন তিনি উধাও হইয়া গেলেন। একা গেলেন না। শ্যামার মামাবাড়ির গ্রামে আজীবন সন্ন্যাসী-ঘেঁষা প্রৌঢ়বয়সী ব্রহ্মচারী মামাটির কীর্তি এখনও প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এই জন্য যে, শ্যামার মামা সামান্য লোক হইলেও আসল কলঙ্ক যাদের, তাদের চেয়ে বনেদি ঘর আশপাশে দশটা গ্রামে আর নাই। এই গেল শ্যামার দিকের হিসাব। স্বামীর দিকের হিসাব ধরিলে বিবাহের পর শ্যামা পাইয়াছিল শুধু একটি বিবাহিতা রুগ্‌ণ ননদকে।

সে মন্দাকিনী।

প্রথমবার স্বামীগৃহে আসিয়া শ্যামা কোনোদিকে তাকানোর অবসর পায় নাই। মন্দাকিনী তখন সুস্থ ছিল। নিজের নানাপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি, প্রতিবেশিনীদের ভিড়, বউভাতের গোলমাল সব মিলিয়া তাহাকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মামার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সে শুধু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল কয়েকটা হইচই-ভরা দিনের স্মৃতি। ছ'মাস পরে এক আসন্ন-সন্ধ্যায় আবার এ বাড়িতে পা দিয়া চোখে সে দেখিয়াছিল অন্ধকার। এ কী অবস্থা বাড়িঘরের? বাড়িতে মানুষ কই? লণ্ঠন দুটো ধোঁয়া ছাড়িতেছে, উঠানে পোড়া কয়লা, ছাই ও হাজার রকম জঞ্জালের গাদা, দেয়ালে দেয়ালে ঝুল, পায়ের তলে ধুলাবালির স্তর! আর এক ঘরে মরমর একটা মানুষ।

সে মন্দাকিনী।

শীতল বলিয়াছিল, সব দেখেশুনে নাও। এবার থেকে সব ভার তোমার।

বলিয়া সে উধাও হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় খাবার কিনিতে—এ বাড়িতে রান্নার কোনো ব্যবস্থা আছে শ্যামা তাহা ভাবিতে পারে নাই। সেইখানে, ভিতরের রোয়াকে তাহার ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া, ভয়ে ও বিষাদে শ্যামার কান্না আসিতেছে, এমন সময় সদরের খোলা দরজা দিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল লম্বা-চওড়া জোয়ান একটা মানুষ।

সে রাখাল। মন্দাকিনীর স্বামী।

এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে কীভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইত, জানিবার উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল। শুধু সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি। এতদিন রাখাল যেসব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু করে নাই, এবার শ্যামার সঙ্গে সমস্তই সে করিয়া ফেলিল। প্রথমেই বাড়িঘর সাফ হইল। তারপর আসিল কুকারের বদলে পাচক, ঠিকা ঝির বদলে দিবারাত্রির পরিচারিকা। হাট-বাজার রান্না-খাওয়া সব অনেকটা নিয়মিত হইয়া আসিল।

মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল আরও পাঁচ-ছয় মাস এখানে ছিল। সে সময়টা শ্যামার বড় সুখে কাটিয়াছিল। সে সময়মতো স্নানাহার করে কি না রাখাল সেদিকে নজর রাখিত, হাসি-তামাশায় তাহার বিষণ্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত, শ্যামার বয়সোচিত ছেলেমানুষিগুলি সমর্থন পাইত তারই কাছে। শীতলের মাথায় যে একটু ছিট আছে এটা শ্যামা গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। শীতলকে সে বড় ভয় করিত, পুরনো হইয়া আসিলেও এখন পর্যন্ত সে ভয় তাহার রহিয়া গিয়াছে। শীতলের না ছিল নেশার সময়-অসময়, না ছিল খেয়ালের অন্ত ও মেজাজের ঠিকঠিকানা। প্রথম ছেলেকে কোলে পাইয়া শ্যামা পূর্ববর্তী সাতটা বছরের ইতিহাস আঁতুড়েই অনেকবার স্মরণ করিয়াছে—যেসব দোষের জন্য শীতল তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল তাহা মনে করিয়া জ্বলিবার জন্য নয়—শীতল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল নিজের একটিমাত্র লঘু অপরাধের কথা যদি মনে পড়িয়া যায়, এই আশায়। শীতলের কাছে তাহার কোনো ত্রুটির মার্জনা না থাকাটা ছিল এতবড় নিরেট সত্য। কেবল রাখালের কাছেই শ্যামার অপরাধও ছিল না, ত্রুটিও ছিল না। রাখালের এই সহিষ্ণুতা শ্যামার কাছে আরও পূজ্য হইয়া উঠিবার অন্য একটি কারণ ছিল। সে মন্দার গালাগালি। মন্দার অসুখটা ছিল মারাত্মক। স্বভাবও তাহার হইয়া উঠিয়াছিল মারাত্মক। মন্দার পান হইতে চুনটি শ্যামা কখনো খসাইত না বটে—পান মন্দা খাইত না, কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না—অনুরূপ তুচ্ছ অপরাধে চিঁ চিঁ করিয়া সে এত এবং এমন সব খারাপ কথা বলিত যে শ্যামার মন তিক্ত হইয়া যাইত। শীতলের কোলে গরম চা ফেলিয়া [ভয়ে] গালে একটা চড় খাওয়ার পরক্ষণেই বার্লি দিতে পাঁচ মিনিট দেরি করার জন্য [গালে চড় খাইলে মিনিট পাঁচেক না কাঁদিয়া সে পারিত না] মন্দার গাল খাইয়া নিজেকে যখন শ্যামার বিনামূল্যে কেনা দাসীর চেয়ে কম দামি মনে হইত, রাখাল তখন তাহাকে কিনিয়া লইত দুটি মিষ্টি কথা দিয়া।

শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি নয়, রাখাল তাহার অনেক লাঞ্ছনাও বাঁচাইয়া চলিত। কতদিন গভীর রাত্রিতে শীতল বাড়ি ফিরিলে [বন্ধুরা ফিরাইয়া দিয়া যাইত] রাখাল তাহাকে বাহিরে আটকাইয়া রাখিয়াছে, শ্যামার কত অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়া শীতল দেখিয়াছে রাখাল সে অপরাধের অংশীদার, শ্যামাকে শাসন করিবার উপায় নাই। শীতলের কত অসম্ভব সেবার আদেশ রাখাল যাচিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে এভাবে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা বিপজ্জনক, বিশেষ স্ত্রীটির যদি বয়স বেশি না হয়। স্বামী নানারকম সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু রাখাল ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাকিতে সংসারে শ্যামা তার জুড়ি দেখে নাই। যেসব আশ্চর্য কৌশলে শীতলকে সে সামলাইয়া চলিত, শ্যামাকে আড়াল করিয়া রাখিত, আজও মাঝে মাঝে অবাক হইয়া শ্যামা সেসব ভাবে। মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে রাখাল তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল বনগাঁ। কলিকাতার এত আপিস থাকিতে বনগাঁয়ে তাহার চাকরি করিতে যাওয়া শ্যামা পছন্দ করে নাই। একদিন, রাখালদের চলিয়া যাওয়ার আগের দিন, ওই কথা লইয়া রাগারাগিও সে করিয়াছিল। বয়স তো শ্যামার বেশি ছিল না। জগতে কারও স্নেহে যে কারও দাবি জন্মে না এটা সে জানিত না। আকুল আগ্রহে বিনা দাবিতেই স্বামীর চেয়ে আপনার লোকটিকে সে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। রাখাল চলিয়া গেলে সে দু-চারদিন চোখের জল ফেলিয়াছিল কি না আজ প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর শ্যামার আর তাহা স্মরণ নাই। সমস্ত নালিশ সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলিকে হয়তো সে রহস্যে ঢাকিয়া রাখিতে ভালোবাসে, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। যতই আপনার হইয়া উঠুক, রাখালকে শ্যামা এক ফোঁটা বুঝিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শরীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুর না শয়তানের কোনোদিন তাহা সঠিক জানিবার ভরসা শ্যামা রাখে না। তখন দ্বিপ্রহরে গৃহ থাকিত নির্জন, সন্ধ্যার পর দুটি ভাঙা লণ্ঠনের আলোয় বাড়ি অর্ধেকও আলো হইত না। শীতল যেদিন রাত্রে দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিত, দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিয়মাধীন জীবনযাপন স্বভাবতই শ্যামার কাছে অবাস্তব হইয়া উঠিত—বয়স তো তাহার বেশি ছিল না। সুতরাং রাখালকেও তাহার মনে হইত নির্মম, মনে হইত লোকটা স্নেহ করে কিন্তু স্নেহের প্রত্যাশা মিটায় না।

শীতলের তখন নিজের একটা প্রেস ছিল, মন্দ আয় হইত না। তবু অভাব তাহার লাগিয়াই থাকিত। শীতলের মাথায় ছিট ছিল রকমারি, অর্থ সম্বন্ধে একটা বিকৃত উদাসীনতা ছিল তার মধ্যে সেরা। তাহার মনকে বিশ্লেষণ করিলে যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কেবল, সে চেষ্টা করিবার মতো অসাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট্য ইহা নয়। টাকার প্রতি মমতার অভাবটা অনেকেই নানা উপায়ে ঘোষণা করিয়া থাকে। শীতলের উপায়টা ছিল বিকারগ্রস্ত—তাহা ভীরুতা ও দুর্বলতার বিষে বিষাক্ত। যেসব বোকার-দল চিরকাল বুদ্ধিমানদের ভোজ দিয়া আসিয়াছে, সে ছিল তাদের রাজা। বন্ধুরা পিঠ চাপড়াইয়া তাহার মনকে গড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা করিত, তাই পাছে কেহ টের পায় যে, মন তাহার আসলে বড়বাজারের গলি, এই ভয়ে সর্বদা সে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ফেরত পাইবে না জানিয়া টাকা ধার দিত সে, থিয়েটারের বক্স ভাড়া করিত সে, মদ ও আনুষঙ্গিকের টাকা আসিত তাহারই পকেট হইতে। বিকালের দিকে প্রেসের ছোট

আপিসটিতে হাসিমুখে সিগারেট টানিতে টানিতে দু-চারজন বন্ধুর আবির্ভাব হইলে ভয়ে তাহার মুখ কালো হইয়া যাইত। পাগলামি ছিল তাহার এইখানে। সে জানিত বোকা পাইয়া সকলে তাহার ঘাড় ভাঙে, তবু ঘাড় ভাঙিতে না দিয়াও সে পারিত না।

শেষে, শ্যামার বিবাহের প্রায় চার বছর পরে শীতলের প্রেস বিক্রয় হইয়া গেল। আবোল তাবোল যেমনি খরচ করুক, আয় ভালো থাকায় এতকাল মোটামুটি একরকম চলিয়া যাইত, প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়িটা পৈতৃক না হইলে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হয়তো তাহাদের গাছতলাই সার করিতে হইত। এই অভাবের সময় শ্যামার মামার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার শোক শীতলের উথলিয়া উঠিয়াছিল, সব সময় শ্যামাকে কথার খোঁচা দিয়াই তাহার সাধ মিটিত না। শ্যামার গায়ে তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম মা হওয়ার সময় শ্যামার কোমরের কাছে যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বুড়ি দাই আফসোস করিয়াছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল, ওটা ফোড়ার দাগ, ছড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয় নাই, ছাতির ডগাতেও নয়। ওটা বঁটিতে কাটার দাগ। বঁটি দিয়া শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠ্যালা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারি।

তরকারি সে আজও কোটে। সুখে-দুঃখে জীবনটা অমনই হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারি থাকার মতো চলনসই। অনেকদিন প্রেসের মালিক হইয়া থাকার গুণে একটা প্রেসের ম্যানেজারির চাকরি শীতল মাস ছয়েক চেষ্টা করিয়াই পাইয়াছিল। শ্যামা প্রথমবার মা হওয়ার সময় শীতল এই চাকরিই করিতেছিল।

বিবাহের সাত বছর পরে প্রথম ছেলে হওয়াটা খুব বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অমন বিলম্বিত উর্বরতা বহু নারীর জীবনেই আসিয়া থাকে। শ্যামার যেন সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। প্রথম ছেলেকে প্রসব করিতে সে সময় লইল দুদিনের বেশি এবং এই দুটি দিন ভরিয়া বারবার মূর্ছা গেল।

শেষ মূর্ছা ভাঙিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে। সে বাতাসের মতো হালকা। শীতকালের পুঞ্জীভূত কুয়াশার মতো সে যেন আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কর অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময়। একবার তাহার মনে হইল সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া ফাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা ক্লান্তিকর যাতনা তাহার অশরীরী আত্মারই দুর্ভোগ।

তারপর চোখ মেলিয়া প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। চোখের সামনে সাদা দেয়ালে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার হাতখানেক উপরে জানালার একটা পাট অল্প একটু ফাঁক করা। ফাঁক দিয়া

খানিকটা কালো আকাশ ও কতকগুলি তারা দেখা যাইতেছে। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ শ্যামার নাকে লাগিয়াছিল। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেয়ালের ছায়াটা তাহার নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমনভাবে সে শুইয়া আছে কেন? তাহার কী হইয়াছে? কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ কীসের? কথা বলিতেছে কারা?

হঠাৎ সব কথাই শ্যামার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পাশ ফিরিতে গিয়া সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের মতো তীব্র একটা ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া যাওয়ায় সে আবার দেহ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। মনের প্রশ্নকে বিহ্বলের মতো উচ্চারণ করিয়াছিল এই অর্থহীন ভাষায় : কোথায় গেল, কই? কে যেন জবাব দিয়াছিল : এই যে বউ এই যে, মুখ ফিরিয়ে তাকা হতভাগী!

কাছে বসিয়াও অনেক দূর হইতে যে কথা বলিয়াছিল সে বোধহয় শ্যামার একখানা হাত তুলিয়া একটি কোমল স্পন্দনের উপর রাখিয়াছিল। জাগিয়া থাকিবার শক্তিটুকু শ্যামার তখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। সে অতিকষ্টে একটু পাশ ফিরিয়াছিল। 'দেখবি বউ? এই দেখ—'

এবার স্বর চিনিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল—'ঠাকুরঝি?'

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—'আর ভাবনা কী বউ? ভালোয় ভালোয় সব উতরে গিয়েছে। খোকা লো, ঘর আলো করা খোকা হয়েছে তোর।'

মাথা তুলিয়া একবার মাত্র খানিকটা রক্তিম আভা ও দুটি নিমীলিত চোখ দেখিয়া শ্যামা বালিশে মাথা নামাইয়া চোখ বুজিয়াছিল।

শ্যামার যে সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পরদিন সকালেই সে তাহার প্রথম ছেলেকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিয়া নিজেকে শ্যামার অনেকটা সুস্থ মনে হইয়াছিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না। কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের! মাথা ও ভুরুতে চুলের শুধু আভাস আছে। বেদানার জমানো রসের মতো তুলতুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট। এ কি তার ছেলে? এই ছেলে তার? গভীর ঔৎসুক্যে সন্তর্পণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গালে ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়িসংযোগ-বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য এ কী কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দুদিন দুরাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।

তখন ঘটিয়াছিল এক কাণ্ড।

ঘুম ভাঙিয়া হঠাৎ শিশু যেন কীরকম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। টানিয়া টানিয়া শ্বাস নেয়, চঞ্চলভাবে হাত-পা নাড়ে, চোখ কপালে তুলিয়া দেয়। ভয়ে শ্যামা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকিয়াছিল—'ঠাকুরঝি গো, ও ঠাকুরঝি!'

রান্না ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া মন্দা হইয়াছিল রাগিয়া আগুন!

'চোখ নেই বউ? সরো তুমি, সরো। গলা শুকিয়ে এমন করছে গো, আহা! মধুর বাটি গেল কোথা? মিছরির জল? দিয়েছ উলটে? আশ্চর্যি!'

তাকের উপর শিশিতে মধু ছিল। ছোট একটি বাটিতে মধু ঢালিয়া আঙুলে করিয়া ছেলের মুখ ভিজাইয়া চোখের পলকে মন্দা তাহাকে শান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া বলিয়াছিল—'আনাড়ি বলে আনাড়ি, এমন আনাড়ি জন্মেও চোখে দেখিনি মা! কচি ছেলে, পলকে পলকে গলা শুকোবে, তাও যদি না টের পাও তবে মা হওয়া কেন? দাইমাগিও মানুষ কেমন? তামাকপাতা আনতে গিয়ে বুড়ি হলো।'

এই তুচ্ছ ঘটনাটি শ্যামার মনে গাঁথা হইয়া আছে, প্রথম সন্তানকে সে যে বারো দিনের বেশি বাঁচাইতে পারে নাই, তার সবটুকু অপরাধ চিরকাল শ্যামা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সন্তান পরিচর্যার কিছুই সে যে তখন জানিত না, এই ঘটনাটি শ্যামার কাছে হইয়া আছে তাহার আদিম প্রমাণের মতো। তখন অবশ্য সে জানিত না বারো দিন পর পেট ফুলিয়া ছেলে তাহার মরিয়া যাইবে। মন্দা চলিয়া গেলে ছেলের দিকে চোখ রাখিয়া সে শান্তভাবেই শুইয়াছিল, গলা শুকানোর লক্ষণ দেখা গেলে মুখে মধু দিবে। অন্যমনে সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল। দরজা দিয়া দুটি চড়াই পাখি ঘরে ঢুকিয়া খানিক এদিক-ওদিক ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, জানালা দিয়াই রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল শ্যামার শিয়রে। জীবন-মৃত্যুর কথা শ্যামার তখন মনে পড়ে নাই, ভগবানের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বুকে তাহার দুদিন দুধ আসিবে না। নবজাত শিশুর জন্য ভগবান দুদিনের উপবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দার হুকুম স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে ছেলের মুখে সে শুষ্ক স্তন দিয়াছিল। সন্তানের ক্ষুধার আকর্ষণ অনুভব করিয়া ভাবিয়াছিল, হয়তো এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বুকে তাহার যথেষ্ট মমতার সঞ্চার হয় নাই, তা হওয়ার আগে দুধ আসিবে না।

তবু, কোন মা সন্তানের জীবনকে অস্থায়ী মনে না করিয়া পারে? বেলা বাড়িলে পাড়ার কয়েক বাড়ির মেয়েরা শ্যামার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল, শ্যামার তখন যেমন গর্ব হইয়াছিল তেমনি হইয়াছিল ভয়। ভয় হইয়াছিল এই জন্য, দেবতারা গোপনে শোনেন। গোপনে শুনিয়া কোন দেবতার হাসিবার সাধ হয়, কে বলিতে

পারে? তাই বিনয় প্রকাশের জন্য নয়, দেবতার গোপন কানকে ফাঁকি দিবার জন্য শ্যামা বলিয়াছিল—কানাখোঁড়া যে হয়নি মাসিমা, তাই ঢের। বলিয়া তাহার এমনই আবেগ আসিয়াছিল যে ঘর খালি হওয়ামাত্র ছেলেকে সে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

ছেলের গলা শুকানোর স্মৃতি মনে পুষিয়া রাখিবার আরেকটি কারণ ঘটিয়াছিল সেদিন রাত্রে। গভীর রাত্রে।

সারাদুপুর ঘুমানোর মতো স্বাভাবিক কারণেও নিশীথ জাগরণ মানুষের মনে অস্বাভাবিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে তখন বারোটা বাজিয়াছে। শ্যামার কল্পনা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। ঘরের একদিকে বুড়ি দাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কোণে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। এগারোটি দিবারাত্রি এই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলিবে, জাতকের এই প্রদীপ্ত প্রহরী। শিয়রের কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা দুর্গানাম লিখিয়া রাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, কেহ না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যায় আবার দুর্গানামের রক্ষাকবচ লিখিয়া রাখিবে। আঁতুড়ের রহস্য ভয়ে পরিপূর্ণ! এমনি কত তাহার প্রতিবিধান। হঠাৎ শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুশি, সকলের অনুচ্চারিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বুঝিতে বাকি থাকে নাই, এঁরা তাহার সন্তানেরই পূর্বপুরুষ, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু এ কী? বংশধরকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার দিকে এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভয়ে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলের কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আর কখনো সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল এ অপরাধ যেন তাহারা না নেন, আর কখনো এরকম হইবে না। জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।

তারপর ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে শুরু করিয়া দিতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। নিজে সে বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিতে গেলে মাথা ঘুরিত। শুইয়া শুইয়া সে খুঁতখুঁত করিত, 'এটা হলো না ওটা হলো না'—মন্দা বিরক্ত হইত, মাঝে মাঝে রাগিয়াও উঠিত। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। ছেলের অফুরন্ত সেবার এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে সে শুধু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বাকি রাখিত। ছেলেকে খাওয়ানো হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না, কাঁদিলে মুখে স্তন তুলিয়া দিলে চুকচুক করিয়া টানিয়া পেট ভরিয়া আসিলে সে আপনি ঘুমাইয়া পড়িত। খুঁটিনাটি সেবাই ছিল অনন্ত। স্নান করাইয়া চোখে কাজল দিলেই শুধু চলিত না, কী কারণে ছেলের চোখে বড় পিচুটি পড়িতেছিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা মুছিয়া লইতে হইত। মিনিটে মিনিটে